# বাংলার সংস্কৃতি ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক

তপতী সাহা

আমি কী তা জানলে সাধন সিদ্ধ হয়। মানুষ তার হয়ে ওঠার পর্ব থেকেই শুরু করেছে 'আমি কী' তা জানার সাধনা। যে অনুসন্ধান তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক সাংস্কৃতিক মানুষের সামনে। নারী ও পুরুষ হিসেবে এবং একই সাথে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সেই সাংস্কৃতিক মানুষকে খুঁজে বের করতে চাই। বাংলার জল মাটিকে স্পর্শ করে প্রকৃতি ও যন্ত্রের সম্মিলনে আমার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের উত্থানকে তুলে ধরতে চাই। যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে গ্রামে-গঞ্জে, অক্ষর পরিচয়হীন মানুষের হাতে। আমাদের মতো শহুরে কালচারে বড়ো হয়ে ওঠা মধ্যবিত্তদের হাতে নয়।

ঔপনিবেশিক চিন্তা-চেতনার পরিমণ্ডলের আধিপত্যের বাইরে বাংলার ভাবুকতা যেভাবে অসাধারণ ব্যাপ্তি পেয়েছে তার অনুসন্ধানে নিমগ্ন হওয়াই আমাদের আত্মপরিচয় ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান। কেননা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের জাতিগত আত্মপরিচয়ের প্রকাশ ঘটানো ও বাঁচিয়ে রাখা, তাহলে অবশ্যই সংস্কৃতিকে হতে হবে ঔপনিবেশিকতার আধিপত্য ও ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত। সংস্কৃতিকে হতে হবে সর্বজনীন, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত, সংস্কৃতিকে হতে হবে পুরুষতান্ত্রিকতামুক্ত। এই সমস্ত উপাদান কি আমাদের উদ্দীষ্ট সংস্কৃতিতে রয়েছে? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে বরং এই শর্তগুলো মাথায় রেখে আমাদের উত্তরাধিকারের অনুসন্ধান করাই হবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়।

সংস্কৃতি থেকে ধর্মের আচার-সর্বস্বতা খসিয়ে ফেলা যেমন একটি কঠিন কাজ, তেমনি কঠিন পুরুষতান্ত্রিক সংস্কারকে ধুয়ে-মুছে এর মানবিক চেহারাটি খুঁজে বের করা। ঠিক এই বিষয়টিই আমাদের আলোচনার মূল প্রসঙ্গ হলেও আমরা এখানে আসব একটু পরে। আমরা জানি, প্রায় হাজার বছর পূর্বে পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এরপর বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের হাতে বাংলা ভাষার জন্ম। তারপর মধ্যযুগে তুর্কিবিজয় ও মুসলিম শাসকদের সময়ে সেই ভাষার ভিত্তিতে সংস্কৃতি নতুনরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু শাসকদের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস এরকম হলেও আমাদের ভুললে চলবে না বাংলার সংস্কৃতি মূলত গ্রামজীবন থেকেই সঞ্জীবিত এবং এর শিকড়টিও গ্রামজীবনেই প্রোথিত। বাংলার সংস্কৃতির পল্লিপ্রধান চেহারাটি আমাদের এত পরিচিত যে, আমরা এর সহজ ও অনাড়ম্বর উপকরণ ও উপাদানকে আমাদের সংস্কৃতির ধারাবাহিক অবলম্বন হিসেবে ভাবতেও দ্বিধান্বিত হই। তাই যে সহজ অনাড়ম্বর ভাবুকতার দর্শন দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছি, সেটাই কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ মানুষের যাপিত জীবনের দর্শন ও সংস্কৃতি।

কিন্তু বাংলার বেশির ভাগ মানুষের সহজ, অনাড়ম্বর যাপিত জীবনের দর্শনের সাথে জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে আছে প্রাচীন মাহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থের অনুশাসন। এ সবকিছুই নারীর অধস্তনতার কথা প্রচার করে। নারী মানেই বাড়ি, পরিবার ও ঘরোয়া ব্যাপারে দায়বদ্ধ, পুরুষ মানেই তার কাজ রোজগার করা, তার সম্পর্ক বাইরের জগতের সঙ্গে। সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এই অবস্থাকেই 'স্বাভাবিক' বলে প্রচার করে। এমনকি নারী-পুরুষের জন্য নির্দিষ্টকৃত এই বৈষম্যমূলক ভূমিকাকে সাংস্কৃতিক দায়-দায়িত্ব হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করে। কিন্তু নারী-পুরুষের সামাজিক শ্রমবিভাজনের মনোজাগতিক অনুসন্ধান করলেই সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মূল কারণটি বোঝা যায়।

**সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের ভূমিকা**

বিয়ের পর অনেক ধর্মের নারীদেরই কিছু বিশেষ চিহ্ন ধারণ করতে হয়, যেটা তাদের মনে করিয়ে দেয় যে তারা হলেন স্বামীদের সম্পত্তি। যেমন হিন্দু নারীরা বিয়ের পর হাতে একটা লোহা পরেন স্বামীর দীর্ঘ আয়ুর জন্য, যাতে স্ত্রী স্বামীর

আগে মরতে পারেন। আত্মমর্যাদা ও সচেতনতাবোধ থাকলে কেউ নিশ্চয়ই এই চিহ্ন সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার নামে বহন করে চলবে না। কিন্তু কেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর আত্মপরিচয় বিলোপ করে রাখার এই প্রচেষ্টা? অথচ বাংলার সংস্কৃতির শিকড়ের সন্ধান মানে 'মানুষ' হিসেবে আত্মপরিচয়েরই অনুসন্ধান। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে বাংলার সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো কি সম্ভব? আর সম্ভব হলেও সেটা কি বাংলার মানুষের আসল সংস্কৃতি নাকি পশ্চাৎপদ সংস্কারেরই রূপবদল মাত্র? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্যই নারী-পুরুষের প্রজনন ভূমিকা ও তার মনোজাগতিক কারণ বিশ্লেষণ জরুরি। প্রজননগত পরিমণ্ডলে পুরুষ এবং নারীদের চেতনা ভিন্ন, কারণ শারীরিক দিক থেকে তাদের সন্তান উৎপাদনকারী ভূমিকাগুলো আলাদা। গর্ভধারণের দীর্ঘ সময় এবং গর্ভাবস্থা ও উৎপাদিত সন্তানের জন্ম এই পুরো সময়টাতে পুরুষ 'অশ্রমিক' অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিকভাবে অপারগ হলেও সামাজিকভাবে তার যে এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটা ভাবারও প্রয়োজন বোধ করে না। প্রজননশীল জগতে তাদের ভূমিকাকে ব্যাখ্যা ও নিশ্চিত করার জন্য এবং একটা লিঙ্গগত গোষ্ঠী হিসেবে তাদের এই বিচ্ছিন্নতাকে পূরণ করার জন্য অর্থাৎ পিতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য তারা পুরাণকাহিনি, সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলেছে, যেখানে পুরুষতান্ত্রিকতার অনুশীলন করা হয়। এইভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রজননশীল পরিমণ্ডলে অর্থাৎ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য সুনিশ্চিত হয়েছে। পুরাণকাহিনিগুলোতে সন্তানের জন্মে পিতার ভূমিকাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, বাস্তবে যে গুরুত্ব তার প্রাপ্য নয়। অন্যদিকে নারীর ভূমিকাকে অবহেলা করা হয়। অথবা নারীকে মা হিসেবে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে মেয়েদের কেবল মা হওয়ার ব্যাপারে এবং ঘরের সীমানার ভেতরে থাকতে বেশি উৎসাহ দেওয়া হয়। এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে ধ্বংস ও নারীকে অধস্তন করার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।

**বাংলার সংস্কৃতি ও নারী-পুরুষের সম্পর্ক**

আগেই বলেছি, সংস্কৃতিকে পুরুষতান্ত্রিক সংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু সংস্কৃতির নিধর্মীকরণের মতো এও এক দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনুশীলনের পথ। কেননা আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতির যে উত্তরাধিকার তার সঙ্গে নারীর অধস্তনতার বিষয়টি এমনভাবে জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে আছে যে, অনেক সময়ই সংস্কৃতির শরীর থেকে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সংস্কার আলাদা করা যায় না। অনেকেই বলে থাকেন নারী আন্দোলনের নামে, নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্য দূর করতে গিয়ে নাকি বাংলার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের লালিত ও সংরক্ষিত আচার, রীতিনীতি, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে— এ কথাটি প্রায়শই শোনা যাচ্ছে। এই ধরনের একপেশে অ বৈজ্ঞানিক চিন্তার, প্রশ্নের উত্তর দেয়া জরুরি না-হলেও এই প্রেক্ষিতে সমাজের পশ্চাৎপদ চিন্তার মোকাবিলা করার জন্য কিছু প্রশ্নের উত্থাপন ও অনুসন্ধান অবশ্য কর্তব্য। যেমন, নারীর ব্যক্তিপরিচয় কি স্বীকৃতির অযোগ্য? নারীমুক্তি আন্দোলন কি সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখার আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্ববিরোধী? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার জন্যই একটু পুরানো বাঙালি সমাজের দিকে তাকানো যাক। সেই সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপটি কেমন ছিল? সেই সময়ে নারী-পুরুষের মধ্যে সুস্থ-সমন্বিত সম্পর্ক কখনোই ছিল না। বিবাহপ্রথার মাধ্যমে নারী-পুরুষের একমাত্র যে স্বীকৃত সম্পর্ক ছিল, সেটাও ছিল সমগ্র পরিবারের কর্তা-কর্ত্রীদের নির্দেশে পরিচালিত। যার ফলে সেই পুরাতন বাঙালি সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে সত্যিকার সহজ, সুস্থ সম্পর্ক কখনো ছিল না। তাছাড়া বহুবিবাহের প্রকোপ যতদিন প্রবল ছিল, ততদিন নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যিকার ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কোনো বস্তুগত শর্তই ছিল না। যদিও এখনো বাংলাদেশে আইনগতভাবে বহুবিবাহ স্বীকৃত। এখন এই প্রথার অনুশীলন ও টিকিয়ে রাখাকে নিশ্চয়ই কোনো সুস্থচিন্তার মানুষ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বলবেন না। পুরাতন বাঙালি সমাজে পারিবারিক জীবনের কাঠামোর মধ্যে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অমানবিক ও কদর্য দিকটির প্রাধান্য ছিল। বাঙালি সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাব আসার আগে পর্যন্ত নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে বয়স্ক ভদ্র প্রাচীনেরা কোনো কথা বলতেন না।

সেই অন্ধকার সময় অতিক্রম করে বাঙালি জীবনে সুস্থ-স্বাভাবিক নতুন ভালোবাসার সম্পর্কের শুরু ঠিক তখন থেকেই, যখন বাঙালি তাঁর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। বাংলার নদী-জল, ঘাট-মাঠের সৌন্দর্য আত্মস্থ করার প্রক্রিয়ার ভেতর থেকেই একদিকে যেমন বাংলার সংস্কৃতি পুষ্টিলাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্য ও জীবনে নারী-পুরুষের মানবিক ও ভালোবাসার সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটেছে। আসলে সংস্কৃতির সঙ্গে নারীর ব্যক্তি পরিচয়ের অধিকারের কোনো বিরোধ নেই, আছে কেবল ঐক্যের সীমারেখা খুঁজে বের করার সমস্যা। যেমন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে গৃহস্থ-ঘরের বাঙালি মেয়ের মুখশ্রীর সঙ্গে তুলনা করা আমার সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক প্রকাশ। এই ধরনের স্বাভাবিক বর্ণনায় কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু কেউ যখন বাংলার নারী মানেই নুয়ে পড়া, নিজস্বতা বিসর্জন দেওয়া এক চরিত্রের চিত্রায়ণ করেন, সেখানে সংস্কারাচ্ছন্ন মূল্যবোধেরই প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশ কখনো বাংলার আসল সংস্কৃতি নয়।

অথচ গ্রামবাংলার শ্রমজীবী, বাউল, বৈষ্ণব নারীদের হাতে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাদের স্বাধীন, ঋজু চরিত্রের কথা আমরা ভুলে বসে থাকি। তাছাড়া সমস্যা ঘটে ঠিক তখনি যখন আমরা সাংস্কৃতিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব একা নারীর ওপর চাপিয়ে বসে থাকি। পুরুষ যখন অর্থ উপার্জন করে, দেশের নেতা হয়, গবেষণা করে, ইচ্ছামতো বিভিন্ন দেশের পোশাক পরে, তখন একবারও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল বলে কেউ চিৎকার করে না। কিন্তু দেশসুদ্ধ সবাই হাহাকার করতে থাকেন যখন নারীর ক্ষেত্রে ওই অধিকার অর্জন ও ভোগের বিষয়টি আসে। দ্বন্দ্বটা এক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর এরকম ভাবার কোনো যুক্তি নেই, আসলে সমস্যা আমাদের চিন্তাগত অস্বচ্ছতার। বৈষয়িক জীবনযাপনের বুদ্ধি আর মনকে, অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখার বুদ্ধি এক নয়। জীবন ও প্রেম প্রতিফলিত হয় যে মনে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে ও লালন করে সংস্কৃতি। এর সাথে বৈষয়িক অধিকার অর্জনের কোনো বিরোধিতা নেই। যেমন আরেকটু সহজ করে বললে বলা যায়, নারী-পুরুষের সম্পর্কের সবচেয়ে বিকশিত সামাজিক রূপ হচ্ছে প্রজাতি পুনরুৎপাদনের সম্পর্ক, আমাদের প্রত্যাশিত সমাজে এই সম্পর্কের ভিত্তি হবে প্রেম। এখন এই সম্পর্কের জন্য জরুরি নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ও আরো বিকশিত করা। এখানে সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সামাজিক বৈষম্য টিকিয়ে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। সেটি হচ্ছে বর্তমান পরিবার কাঠামো।

আমরা জানি, বিরাজমান পরিবার পুরুষতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতাকে টিকিয়ে রেখেছে। তাই যখন মোটাদাগে পরিবার উচ্ছেদের কথা বলা হয়, তখন সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং অনেকে বুঝেও না-বোঝার ভান করেন। প্রজাতি পুনরুৎপাদন বা বংশরক্ষা পারিবারিক নয়, সামাজিক হয়ে উঠবে। এর মানে পুরুষের একার সিদ্ধান্ত নয়, নারীর সিদ্ধান্ত ছাড়া কোনো সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের সুযোগ থাকবে না এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটবে। তখন সতিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক ছাড়া, পরস্পরের প্রতি গভীর আনুগত্য ও প্রেমের উপস্থিতি ছাড়া সন্তানধারণের কঠিন দায়িত্ব কোনো নারীকে বহন করতে হবে না। নারী-পুরুষের এই ধরনের বিকশিত সম্পর্কের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির কোনো বিরোধিতা নেই; বরং বাংলার নদী, জল থেকে উত্থিত সংস্কৃতি নারী-পুরুষের সম্পর্কের বিকশিত রূপ নির্মাণের শর্ত তৈরি করে।

### উৎপাদনসম্পর্ক, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি যেমন মানুষের জাতিগত আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, তেমনি যেকোনো দেশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে সেই সমাজের, সময়ের সুনির্দিষ্ট উৎপাদনসম্পর্ককে কেন্দ্র করে। তাই সংস্কৃতির সাথে উৎপাদন সম্পর্ক ও রাষ্ট্রের সম্পর্কটি অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যখনই কোনো জাতির সংস্কৃতি এবং সেই সমাজের মানুষের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে হয়, তখন অবশ্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্র কাঠামো ও উৎপাদনসম্পর্কের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করতে হবে। যেমন সামন্তীয় সমাজের সংস্কৃতি আর পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কৃতি এক রকম নয় এবং হওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। এই ধরনের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপটিও ভিন্ন হতে বাধ্য। তাই সম্পত্তি, সম্পত্তির ধরন, উত্তরাধিকার ও উৎপাদনসম্পর্ক-নির্ভর সমাজের যেকোনো ধরনের সম্পর্ক এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক আলাদা নয়, স্থিরনির্দিষ্ট কিছু নয়। সম্পত্তি, সম্পত্তির ধরন ও উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষের সম্পর্কের রূপের বদল ঘটছে প্রতিনিয়ত। এমনকি পুরুষতান্ত্রিকতার রূপেরও পরিবর্তন হয়েছে। এইসব বিষয় সংস্কৃতির সাথে মিলিয়ে আলোচনা করা কঠিন হলেও এটি বৈজ্ঞানিক সত্য এবং আমাদের এই সত্য মনে রাখতেই হবে।

### সংস্কারের বাহক হিসেবে নারী

পরিবারে ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী দ্বারা নারী নির্যাতনের ঘটনা এবং পশ্চাৎপদ মূল্যবোধ, সংস্কারের ধারক-বাহক হিসেবে নারীর ভূমিকার বিষয়টি নারী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চলমান বিতর্কের বেশ অস্বচ্ছ একটি জায়গা। আন্দোলনের শত্রু-মিত্র উভয়ের জন্যই এই দিকটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দেখা গেছে, নারী দ্বারা নারী নির্যাতনের ঘটনা এবং নারীর পশ্চাৎপদ মানসিকতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিপক্ষীয়রা যেমন নারীমুক্তি আন্দোলনের অসারতা প্রমাণ করতে চান, নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যকে আড়াল করতে চান, তেমনি আন্দোলনের পক্ষের অনেকেই, দেখা গেছে, এইসব ঘটনার উল্লেখ করা হলে কোনো সঠিক উত্তর খুঁজে পান না। আবার অনেকে এগুলোকে ব্যতিক্রম হিসেবে দাঁড় করানোর যুক্তি খোঁজেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কী? একটু তলিয়ে দেখা যাক। যেমন শাশুড়ি তাঁর ছেলের বৌকে নির্যাতন করে কিন্তু মেয়ের জামাইকে অতিরিক্ত আদর-যত্ন করে। এই ধরনের আচরণের পেছনে নারীর ভেতর দীর্ঘদিনের লালিত পুরুষতান্ত্রিকতারই প্রকাশ ঘটে। যে শাশুড়ি ছেলের বৌকে নির্যাতন করছে, সেই একই ব্যক্তি মেয়ের জামাইয়ের ক্ষেত্রে উলটোটি ঘটাচ্ছে। কারণ এখানেও ওই নারী কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গেই আপোষ করছে। বঞ্চিত বা নির্যাতিতরাও তাঁর কাছাকাছি দুর্বল অবস্থানে আছে এরকম কারো ওপর প্রভুত্ব করতে পছন্দ করে। তাছাড়া শাশুড়ি বৌকে নির্যাতন করে তাঁর পারিবারিক কর্তৃত্ব,

অধিকার হারানোর বোধ ও অনিশ্চয়তার বোধ থেকে। কারণ পরিবার কাঠামোর বাইরে নারীর ভূমিকার সুযোগ ও স্বীকৃতি নেই বললেই চলে।

নারীর মধ্যে শারীরিক কারণে, সংস্কার ও সাংস্কৃতিক কারণেও বিভিন্ন ধরনের পবিত্রতা-অপবিত্রতা, শুচিতার ধারণা গড়ে উঠেছে। এর জন্য মূলত ধর্মীয় আচার, বিশ্বাস, প্রথা দায়ী হলেও এটা সত্যি যে এই ধারণাগুলো নারীই বহন ও চর্চা করে। এইসব কুসংস্কার, বিশ্বাস সেখানেই প্রবল, যেখানে নারী অশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আকালে ভুগছে। শারীরিক পুরুষের মাধ্যমে নারীর ওপর হাজার বছর ধরে অমানবিক আধিপত্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটলেও যে নারী এই চিন্তায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সে নারীর মাধ্যমেও এ ধরনের প্রকাশ ঘটে থাকে এবং ঘটা বর্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক। তাই পুরুষতন্ত্রের উচ্ছেদ কেবল নারীর জন্য নয়, নারী-পুরুষের সুস্থ মানবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যই জরুরি। কেননা পুরুষতন্ত্র যেমন নারীকে অধিকারবঞ্চিত করে, তেমনি পুরুষকেও মানবিক বিকাশে, মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। তাই সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাসের শরীর থেকে পশ্চাৎপদতার অপসারণ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে জরুরি। যদিও এই পৃথকীকরণ একটি দুরূহ কাজ এবং অত্যন্ত সতর্কভাবেই সেটি করতে হবে। আমাদের আত্মপরিচয়ের নিজস্ব দর্শনই সন্ধান দেবে সেই উৎসের, যেখানে প্রোথিত আছে 'দুগ্ধে বারি মিশাইলে বেছে খায় রাজহংস হলে' (লালনগীতি)— এই করণপন্থা।

**তপতী সাহা** একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় জেন্ডার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত। tapati_medha@hotmail.com